গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা | ১৬ - ২২ আগস্ট ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের শিক্ষা থেকে

২৮ নভেম্বর ১৮২০ - ৫ আগস্ট ১৮৯৫

এ বছর ৫ আগস্ট ছিল বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক ও মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের ১২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষে তাঁর 'সমাজতন্ত্র ঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক' রচনা থেকে একটি অংশ প্রকাশ করা হল।

কিন্তু পণ্য উৎপাদনের প্রসার এবং বিশেষ করে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের সাথে সাথে পণ্য উৎপাদনের নিয়মগুলি যা এতদিন সুপ্ত ছিল, তা আরও খোলাখুলি আরও বেশি শক্তি নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল। পুরনো বন্ধনগুলো আলগা হয়ে গেল, বিচ্ছিন্নতার পুরনো সীমা ভেঙে পড়ল, উৎপাদকরা আরও বেশি বেশি করে স্বাধীন স্বতন্ত্র পণ্য উৎপাদকে রূপান্তরিত হল। এ সত্য পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সমাজের সমগ্র উৎপাদনে এতদিন রাজত্ব করেছে পরিকল্পনাহীনতা, আকস্মিকতা ও নৈরাজ্য এবং এই নৈরাজ্য ক্রমেই আরও ব্যাপক ও চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। কিন্তু যে প্রধান উপায়ের সাহায্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি সমাজীকৃত উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যকে তীব্র করে তোলে, তা নৈরাজ্যের ঠিক বিপরীত। এই উপায়টি হল, উৎপাদনশীল প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটা সামাজিক ভিত্তির উপর উৎপাদনের কাজ পরিচালনার উপযুক্ত এবং ক্রমান্বয়ে আরও মজবুত সংগঠন দাঁড় করানো।

সাতের পাতায় দেখুন

রেহাই পেলেন না কর্তব্যরত চিকিৎসকও

কাকে আড়াল করতে তদন্তে টালবাহানা

আর জি কর

নিজের হাসপাতাল, নিজের ডিপার্টমেন্টের মধ্যেই ধর্ষিতা হয়ে খুন হতে পারেন তা ভাবতেও পারেননি কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসক। ভাবতে পারেননি কোনও মানুষই বোধহয়। একজন চিকিৎসক তাঁর নিজের হাসপাতালে, নিজের পরিবেশেও যদি নিরাপদ না হন, তা হলে এ দেশে কোথায় নিরাপদ মেয়েরা? শিউরে উঠেছে সারা দেশ। মানুষের প্রাণ রক্ষার কাজে যিনি রাত জাগছিলেন, নারকীয় আক্রমণে তাঁকেই ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। চিকিৎসক তরুণীর বিধ্বস্ত প্রাণহীন দেহটা তীব্র যন্ত্রণায় নাড়িয়ে দিয়েছে প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে। দল-মত নির্বিশেষে তীব্র ক্ষোভে তাঁরা ফেটে পড়েছেন। সারা দেশের চিকিৎসকরাও সামিল হয়েছেন বিক্ষোভে।

'তদন্ত চলছে'— পুলিশ যথারীতি এই বয়ানে অনড়। জনগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ লক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী

চারের পাতায় দেখুন

কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আর জি কর হাসপাতালে চলা লাগাতার বিক্ষোভ

সাম্প্রদায়িক অপচেষ্টা রুখে দেবে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা— এ আমার বিশ্বাস

প্রভাস ঘোষ

৫ আগস্ট কলকাতায় রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ এক ঐতিহাসিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। দিনের পর দিন লাঠি, গুলি, বেয়নেটের সম্মুখীন হয়ে কয়েকশো প্রাণ শহিদের মৃত্যুবরণ করার পরেও সরকারের পতনের দাবিতে সেখানকার ছাত্র-জনতা লড়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে এ এক ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান। আজকেও লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায়। একটু আগে খবর এসেছে এই জনগণের দাবিতে ওখানকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। মিলিটারি ক্ষমতা হাতে নিতে চেয়েছিল। জনগণ তার বিরোধিতা করে বলছে, মিলিটারি শাসন নয়, অন্তর্বর্তী সরকার চাই। এখন তা নিয়ে আলোচনা চলছে। এ কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, একদল প্রচার করছে, এর পিছনে ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি জামাত, বিএনপি আছে— এটা আদৌ ঠিক নয়। আপনারা লক্ষ করলে দেখবেন, লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রলালের গান, সত্য চৌধুরীর 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে', এই সব গান যা এক সময় ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই বাংলার যৌবনকে উজ্জীবিত করেছিল। বিপ্লববাদকে অনুপ্রাণিত করেছিল। যার প্রভাব গোটা ভারতবর্ষে সঞ্চারিত হয়েছিল। সেই গানই আজ বাংলাদেশের এই সংগ্রামী ছাত্র সমাজের কণ্ঠে। এই গান গেয়েই তারা শয়ে শয়ে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন।

আপনারা জানেন কি না আমি জানি না, কুমিল্লার একটা ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের হোস্টেলে হলের নাম ছিল শেখ হাসিনার নামে। এই ছাত্রসমাজ সেই নাম পাল্টে দিয়ে নাম করেছে শান্তি এবং সুনীতির নামে। কে এই শান্তি-সুনীতি? এই বাংলার লোক অনেকে ভুলে গেছেন, দু'জনেই ছিলেন স্কুলছাত্রী। অত্যাচারী ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করে শাস্তি বিধান করেছিলেন। সেই শান্তি ও সুনীতিকে স্মরণ করেই তারা হলের নাম রেখেছে। আজকের বাংলাদেশ

দুয়ের পাতায় দেখুন

ডাক্তারি ছাত্রীর নৃশংস হত্যা বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি এসইউসিআই(সি)-র

আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দ্বিতীয় বর্ষের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা এই মর্মান্তিক ঘটনায় স্তম্ভিত ও মর্মাহত। অভিযোগ— ছাত্রীটিকে গত রাতে কর্তব্যরত অবস্থায় হাসপাতালের চেস্ট ডিপার্টমেন্টের সেমিনার রুমে পাশবিকভাবে নির্যাতন করে খুন করা হয়েছে। কলকাতার বুকে নামকরা একটি সরকারি মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারের উপর ঘটে যাওয়া এ ধরনের নৃশংস ঘটনাকে নিন্দা জানানোর কোনও ভাষা আমাদের জানা নেই। ন্যক্কারজনক ঘটনা হল, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য প্রথম থেকেই সচেষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তারা লোক-দেখানো একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রী ও ডাক্তারদের বিক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে আগামীকাল ১০ আগস্ট রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমাদের দাবি— ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পোস্টমর্টেম করতে হবে এবং পোস্টমর্টেমের প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করতে হবে, ঘটনায় যুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে ও বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে, হাসপাতালে ডাক্তার নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের আন্দোলন ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে নয়

একের পাতার পর

অবিভক্ত বাংলার যে গৌরবময় ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবেই এক সময় তাঁরা ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন করেছিলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। ঠিক তেমনই আজকে ওই সংসদীয় রাজনীতির ধ্বজাধারী, শত শত ছাত্রের হত্যাকারী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে সেখানকার ছাত্র-জনতা লড়াই করে যাচ্ছেন।

এই আন্দোলন ভারতবর্ষের বিরুদ্ধেনয়। ভারতবর্ষের জনগণের বিরুদ্ধেনয়। ভারতীয় শিল্পপতি এবং পুঁজিপতিরা যারা এই দেশকে লুণ্ঠন করছে তারা বাংলাদেশেও লুঠ চালাচ্ছে। তাদের সাথে চিনের সাম্রাজ্যবাদের প্রতিযোগিতা। ভারত সরকার যেহেতু শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি, বরং সমর্থন করে গেছে এতদিন, সে জন্য ভারত সরকারের বিরুদ্ধে, ভারতের পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনসাধারণের ক্ষোভ দেখা গেছে।

৭ আগস্ট এক সাক্ষাৎকারে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বাংলাদেশের এই ছাত্র আন্দোলনের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক। হাজারে হাজারে লাখে লাখে ছাত্র-ছাত্রী বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে, প্রাণ দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে। এদের কারও পরিচয় মুসলিম বা হিন্দু নয়। যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুসলিম আছেন, হিন্দু আছেন। আওয়ামি লিগ সরকার ফ্যাসিস্ট কায়দায় নৃশংস ভাবে এই আন্দোলন দমন করতে নেমেছে। শান্তিপূর্ণ মিছিলকারীদের ওপরে প্রথমে ছাত্র লিগকে লেলিয়ে দিয়েছিল, পিছনে ছিল পুলিশ। আন্দোলনকারীরা রুখে দাঁড়ালে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। যার ফলে গোটা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রতিবাদে মুখরিত হয়। জনসাধারণের মধ্যেও এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। যত দিন গেছে সরকার ক্রমাগত গুলি চালিয়েছে। হয়তো দেখা যাবে, মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। কেউ বলতে পারছেন না কতজন মারা গেছেন। এই আন্দোলন আদৌ কোনও মৌলবাদী শক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়নি— এটা বাস্তব ঘটনা। এবং আন্দোলনের দাবি আদায় হয়েছে। হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এটা একটা ঐতিহাসিক বিজয়।

এই উপমহাদেশে একমাত্র শ্রীলঙ্কায় কিছুদিন আগে এই ধরনের একটা অভ্যুত্থান ঘটেছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশেও দেখা গেল। এখানে কোনও রাজনৈতিক নেতার নেতৃত্ব ছিল না। কোনও পার্টি ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একটা স্ফুলিঙ্গ থেকে বিরাট অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে। আন্দোলনটা সে ভাবেই গড়ে উঠেছিল।

এখন যেটা ঘটছে, আমার অনুমান, এর পিছনে কাজ করছে— যেহেতু আওয়ামি লিগ এবং ছাত্র লিগ পরাস্ত হয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা আন্দোলনকারীদের কালিমালিপ্ত করার ষড়যন্ত্র করছে। এটা আমার অনুমান যে, এর সাথে যুক্ত বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী, যে পুলিশ বাহিনী গুলি চালিয়েছে। মিলিটারি কিন্তু বিশেষ ভাবে আক্রমণ করেনি। মিলিটারির নিচু তলার যারা ছিল, তাদের প্রবল চাপ ছিল অফিসারদের উপরে, যাতে তারা এই আন্দোলনে সশস্ত্র হামলা না চালায়। কিন্তু পুলিশ, হয়তো এর মধ্যে অধিকাংশই আওয়ামি লিগের সদস্য হিসেবে চাকরি পেয়েছে এবং এরাই নৃশংসভাবে এই আন্দোলন দমন করেছে। এখন এই পুলিশ কিন্তু রাস্তাঘাটে কোথাও নেই, মিলিটারি নেই। তা হলে এর পিছনে একটা ষড়যন্ত্র আছে বুঝতে হবে। তারা চেয়েছে, লুটতরাজ হোক, ভাঙচুর হোক। এরই সাথে সংখ্যালঘুদের কিছু ধর্মীয় স্থানেও হামলা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের উপর কিছু জায়গায় আক্রমণ হয়েছে। কেউ নিহত হয়েছেন— এমন আমার বিশেষ জানা নেই। দুয়েকটা ঘটনা হয়তো বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটতেও পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে এটা শুরু হয়েছে সেই মুহূর্তে আন্দোলনকারীরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে রাস্তায় নেমেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদের একটি বিবৃতি আমি পড়ে শোনাচ্ছি। তাঁরা যে কতটা গুরুত্ব দিয়ে জিনিসটাকে দেখছেন, এ থেকেই বোঝা যায়। বিবৃতিতে লেখা হয়েছে— 'আওয়ামি লিগ বিভিন্ন স্থানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের উপর হামলা করে পুরনো বিভাজনের রাজনীতিকে চাঙ্গা করতে চাইছে। ছাত্র জনতাকে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি। যেখানে মন্দির, প্যাগোডা কিংবা গির্জায় হামলা হবে সেখানে প্রতিরোধ গড়ে তোলো। হামলাকারীদের মোক্ষম জবাব নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। আওয়ামি লিগের সকল নোংরা খেলাই আমরা নস্যাৎ করতে সফল হয়েছি, এ বারও সফল হব। জাতীয় ঐক্যই আমাদের শক্তি।'

এই তাঁদের আহ্বান। এই আহ্বানের ভিত্তিতে তাঁদের হাজার হাজার কর্মী নেমে গেছেন। বিভিন্ন ধর্মস্থানে তাঁরা পাহারা দিয়েছেন। আমি নিজে ফেসবুকে ছবি দেখেছি, মাদ্রাসার ছাত্ররা মন্দির পাহারা দিচ্ছেন। এই যে বিবৃতি তা প্রত্যেকটি মসজিদ থেকে পড়ে শোনানো হচ্ছে এবং হিন্দুদের পাড়া তাঁরা গার্ড করছেন, যাতে হামলা না হতে পারে। ফলে এখানে এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে এই লুঠতরাজ ও হামলার সাথে আন্দোলনকারীরা যুক্ত। বরং তারা এর প্রবল বিরোধী। একে রুখবার জন্য তারা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন।

এই আন্দোলনই আগামী নির্বাচনে বিএনপি বা জামাতের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা তৈরি করল কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন— আমি আগেই বলেছি, এটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জনগণের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে, ছাত্রদের দাবি জানানো হয়েছে। এখন এই সম্ভাবনা থাকতে পারে। আওয়ামি লিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে বিএনপি, জামাত। বাংলাদেশে বামপন্থী শক্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং এই আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে বিকল্প শক্তি হিসাবে বামপন্থীরা এখানে নেই। নির্বাচন হলে এরা হয়তো ক্ষমতায় আসতে পারে। কিন্তু আমি এ কথা বিশ্বাস করি, যে ছাত্রশক্তি, যে জনগণ আওয়ামি লিগের ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, বিএনপি-জামাত একইভাবে যদি জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা করে এবং পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে শাসন চালায় তা হলে এই ছাত্রশক্তি, এই জনগণই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

শুধু ফেসবুকেই নয়, এ দেশের সংবাদমাধ্যমের একাংশ এই আন্দোলন সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রচার চালাচ্ছে, যাতে জনগণের একটা অংশ বিভ্রান্ত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ভারতে যাঁরা সচেতন জনগণ, আমি মনে করি তাঁদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এর পিছনে আর একটা হীন উদ্দেশ্য কাজ করছে। আমাদের দেশে যারা মুসলিমবিরোধী, যারা উগ্র হিন্দুত্বের ও সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করে, তারা সবসময় চেষ্টা করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের অজুহাত খাড়া করে একটা সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করার। কোনও কোনও সংবাদমাধ্যম তাদের হয়ে এই কাজ করছে। ফেসবুকে এসব চলছে। কিন্তু এইসব সংবাদমাধ্যম তো এই কথা প্রচার করছে না যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কী আবেদন করেছেন! তারা তো এই কথা প্রচার করছে না যে মাদ্রাসার ছাত্ররা রাত জেগে মন্দির পাহারা দিচ্ছে, হিন্দু পাড়া গার্ড করছে! তারা প্রচার করছে সেগুলো, যা তাদের স্বার্থে কাজে লাগে। যাতে এখানে একটা মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। এখানে যাতে জনগণের ঐক্যকে ধ্বংস করতে পারে। এখানে তাদের হিন্দুত্বের ভোটব্যাঙ্ক যাতে সৃষ্টি করতে পারে।

আমি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে, ভারতবর্ষের জনগণের কাছে আবেদন জানাব— তাঁরা যাতে এইসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হন। এর কোনও বাস্তবতা নেই। ওই আন্দোলনে, আমি আবারও বলছি, শুধু মুসলিম নয়, হিন্দু ছাত্রছাত্রীরাও প্রাণ দিয়েছে, একই দাবিতে একই রক্ত মিশেছে। এখানে কোনও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ছিল না। আওয়ামি লিগের পক্ষ থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এবং পুলিশ বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রেখে এই ষড়যন্ত্র চলছে, যাতে ওখানেও আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করা যায়। পশ্চিমবঙ্গেও যাতে সাম্প্রদায়িক শক্তি জোরদার হয়। এটা লক্ষণীয় যে, এখানকার যারা হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি তারা এটাকে কাজে লাগাবার অপচেষ্টা করছে। জনগণকে আমি আবেদন করব, তাঁরা যাতে বিভ্রান্ত না হন।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য, দলের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর পূর্বতন সদস্য বিশিষ্ট জননেতা কমরেড কুণাল বিশ্বাস ৪ আগস্ট ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন জটিল রোগে অসুস্থ ছিলেন তিনি।

কমরেড কুণাল বিশ্বাস গত শতকের ষাটের দশকের শেষে ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। ঐতিহ্যশালী কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ার সময় থেকে সারা জেলায় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ডিএসও-র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ে তিনি জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু নয়, গ্রামে গ্রামে ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন। পরবর্তীকালে এস ইউ সি আই (সি) দলের সংগঠক ও নেতা হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ষাটের দশকে যুক্ত বামপন্থী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনের তিনি ছিলেন অগ্রণী সংগঠক। আশির দশকে গড়ে ওঠা বাসভাড়া বৃদ্ধিপ্রতিরোধ আন্দোলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কমরেড কুণাল বিশ্বাস প্রবল পুলিশি আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরবর্তী কালে দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে দেওয়া দায়িত্বের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা গড়ে তোলার কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জেলায় এবং রাজ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এই সংগঠনে যুক্ত করেন। শ্রমিক সংগঠন, বিশেষ করে বহরমপুর স্বর্ণশিল্পী সমিতির পুনর্গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বহরমপুর টাউন মনীষা স্মারক সংস্থার সভাপতি ছিলেন তিনি।

কমরেড কুণাল বিশ্বাস ছিলেন অত্যন্ত কোমল মনের ও আবেগপ্রবণ। ছোটদের সঙ্গে ছিল তাঁর মধুর সম্পর্ক। আবার একই সঙ্গে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, যে কোনও প্রতিকূলতার সামনে দৃঢ়চেতা। কৈশোর-যৌবন থেকে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে শুধু তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল তাই নয়, বহু সময় তিনি তাঁদের বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল করেছেন। পরিবারের দাদা, ভাই, এমনকি তাঁদের স্ত্রী-ছেলেমেয়েরাও দলের সমর্থক-শুভাকাঙ্খী। স্ত্রী আরতি মণ্ডল দলের জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর একমাত্র ছেলেও দলের সাথে যুক্ত।

৭ আগস্ট সকালে কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষ থেকে কমরেড কুণাল বিশ্বাসের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। রাজ্য কমিটির সদস্য সহ বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা শ্রদ্ধা জানান। তার আগে হাসপাতালে মাল্যদান করেন তাঁর দীর্ঘদিনের চিকিৎসক ও দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিপ্লব চন্দ্র ও অন্যরা। ৭ আগস্ট দুপুরে কমরেড কুণাল বিশ্বাসের মরদেহ বহরমপুরে দলের জেলা অফিসে পৌঁছলে মাল্যদান করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কমরেড কুণাল বিশ্বাসের সহযোদ্ধা কমরেড স্বপন ঘোষাল, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ মণ্ডল, জেলা সম্পাদক সাধন রায়ের পক্ষে কমরেড দেবাশীষ চক্রবর্তী সহ জেলার নেতা, কর্মী, সাধারণ মানুষ। সিপিআই(এম)-এর জেলা সম্পাদক সহ ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই(এমএল)-লিবারেশন দলের নেতারা শ্রদ্ধা জানান। এরপর শত শত নেতা-কর্মী-সমর্থক চোখের জলে কমরেড কুণাল বিশ্বাসের শেষযাত্রায় সামিল হন। ১৭ আগস্ট বহরমপুর ঋত্বিক সদনে কমরেড কুণাল বিশ্বাস স্মরণে সভা।

কমরেড কুণাল বিশ্বাস লাল সেলাম

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের পতন

জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিজয়

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী)-র কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড ডাঃ জয়দীপ ভট্টাচার্য ও কমরেড রাসেদ শাহরিয়ার-এর একটি লেখা আমরা প্রকাশ করলাম।

৫ আগস্ট দুপুরে হাজারো মানুষ যখন গণভবনে ঢুকছেন, ততক্ষণে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন। পালিয়েছেন দেশ ছেড়ে। ফেসবুক ছয়লাপ হয়ে গেল একটি শব্দে, 'স্বাধীন'।

'স্বাধীনতা' মানুষের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত শব্দ। পরাধীন মানুষ বা জাতির জীবনে এর চেয়ে বড় আর কিছুই কাম্য হতে পারে না। কিন্তু আমরা তো স্বাধীন হয়েছিলাম ১৯৭১ সালে। পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্যের অবসান ঘটানোর লড়াই ছিল এটি। অথচ দেখা গেল— স্বাধীনতার পর আমরা দেশ পেলাম, কিন্তু স্বাধীন হলাম না। একটি ফুলকে বাঁচানোর জন্য, একটি মুখের হাসির জন্য— দেশের মানুষ সে দিন যুদ্ধে গিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হল, আমরা একটা ভূখণ্ড পেলাম। কিন্তু স্বাধীন দেশে শত শত ফুল ঝরে পড়ল, কত হাসিমাখা মুখ হারিয়ে গেল। আবার শুরু হল লড়াই। সেটা স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে। স্বৈরাচারী এরশাদকে ক্ষমতা থেকে সরানো হল। কিন্তু স্বাধীনতা এল না। জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটা দলের পরিবর্তে আর একটা দল সরকারে এল। সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে না পারায় এদের চরিত্র না বুঝতে পেরে বারবার ঠকল, প্রতারিত হল।

আমাদের স্বাধীনতা ছিল না দুই দলের পালা করে নির্বাচিত হওয়া শাসন-আমলেও। কিন্তু গত ১৬ বছর ধরে আওয়ামি লিগের একচ্ছত্র শাসনামল আগের সব ইতিহাসকেই ম্লান করে দিয়েছে। পাকিস্তানী শাসনের সেই দিনগুলোর তুলনা এসেছে বারবার। এই সময়ে একাত্তরের মতোই গভীর রাতে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের দরজায় টোকা পড়েছে। তাদের জোর করে গাড়িতে তোলা হয়েছে। পরিবারের লোকেরা পরের দিন থানায় থানায় ঘুরেছে। কিন্তু কোনও থানা, কোনও বাহিনী গ্রেফতারের কথা স্বীকার করেনি। তাদের খোঁজ মেলেনি। কারও মিলেছে, কাউকে পরে রাস্তায় অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এইসকল ঘটনা ছিল অহরহ। নিখোঁজ এমন বেশ কয়েকজনকে বের করা হয়েছে এক গোপন আস্তানা থেকে, যার নাম 'আয়নাঘর'। সেখানে আলো বাতাস ঢুকত না। অন্ধকার ঘর, মিলত অবিরাম নির্মম অত্যাচার আর পশুরও অখাদ্য খাবার। সেখানে কেউ আট বছর, কেউ ১০ বছর ধরে বন্দি ছিলেন।

খুব বেশি বড় নেতা হওয়ার দরকার ছিল না। সরকারের বিরুদ্ধে কার্টুন এঁকে গ্রেফতার হয়েছেন কিশোর। ফেসবুকে লিখে গ্রেফতার হওয়া মুশতাক তো আর ফিরলেনই না, জেলেই মারা গেলেন। এই সকল উদাহরণ ব্যতিক্রম নয়, সাধারণ। দেশে সরকার বিরোধী কার্টুন, লেখা, সমালোচনা প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এটা ছিল সত্যিকারের মৃত্যু উপত্যকা। এই তীব্র ক্ষোভই ফেটে পড়েছিল ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে। আর এ কারণেই আওয়ামি লিগের পতনের পর সবাই বুকের চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলছেন, 'স্বাধীন'।

কোটা বিরোধী আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান

শুরুটা হয়েছিল সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা-কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আত্মদান ও আত্মত্যাগের কারণেই দেশের মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে স্বাধীনতার এত বছর পরও তাদের সন্তান সন্ততি শুধু নয়, নাতি-নাতনিদের জন্যও এই কোটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা সহ ৫৬ শতাংশ নিয়োগই হত কোটার ভিত্তিতে। আর এ দিকে দেশ জুড়ে তীব্র বেকার সংকট। শিক্ষিত-অশিক্ষিত মিলে প্রায় ৩ কোটি বেকার। খোদ সরকারি হিসাবেই উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৮ লাখ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সংখ্যা আরও বেশি। 'বিআইডিএস'-এর এক গবেষণায় প্রকাশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাশ করা ৪৮ শতাংশই বেকার। প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী পড়াশোনা শেষ করে শ্রম বাজারে প্রবেশ করছেন। কিন্তু সে তুলনায় চাকরির বাজার সীমিত। সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ। নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি হচ্ছে না। বেকারত্বের বোঝা বয়ে বয়ে গ্লানিতে হতাশায় প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করছে। বাবা-মায়ের হাড় জিরজিরে শরীরে পরিশ্রমের মুষ্টিমেয় পুঁজি সম্বল করে, টিউশন করে, হলের বারান্দায়-মসজিদে কোনও রকমে রাত পার করে অসম্ভব অনিশ্চয়তায় অবশেষে পাশ করেও চাকরি নামক সোনার হরিণ দুর্লভ। ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, প্রশ্নফাঁস তাদের এ যাত্রাকে আরও কঠিন করে তোলে। ফলে বৈষম্য ও বেকারত্বের সাথে সাথে দীর্ঘদিনের এই নিপীড়ন ছাত্র বিক্ষোভকে অনিবার্য করে তুলেছে।

২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সরকার কোটা পদ্ধতি বাতিল করে যে নির্দেশিকা জারি করেছিল, সেটি গত ৫ জুন হাইকোর্টের এক রায়ে বাতিল করে দেওয়া হয়। ওই দিনই তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। নির্দেশিকা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে লাগাতার বিক্ষোভ চলতে থাকে। জুন মাসের মধ্যে দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সরকারের তরফ থেকে আশানুরূপ কোনও উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। ঈদের ছুটির পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সাথে সাথেই জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে আবার বিক্ষোভ শুরু হয়। দেশের প্রথম সারির প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা রাজপথে জড়ো হতে থাকে। পরবর্তীতে প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এসে যোগ দেয়। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৪ জুলাই আপিল বিভাগে শুনানি হলে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেনি। এ দিন শিক্ষার্থীরা ঢাকার শাহবাগ সড়ক অবরোধ করেন। দেশের অনেক জায়গায় একই কর্মসূচি পালিত হয়। পরদিন শুক্রবারও দেশের বিভিন্ন জেলায় সড়ক অবরোধ করা হয়। ৫ জুলাই সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ৬ জুলাই থেকে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি পালন করা হয়।

১০ জুলাই আপিল বিভাগ সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগে (৯ম থেকে ১৩তম) কোটার বিষয়ে ৪ সপ্তাহের স্থগিতাদেশ এবং পরবর্তী শুনানির জন্য ৭ আগস্ট দিন ধার্য করেন। কিন্তু শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরির সব গ্রেডে কোটা সংস্কারের দাবি করে বলেন, এই বিষয়ে আদালত নয়, সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। এবং এই দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন।

আদালতের দোহাই দিয়ে সরকার এ সময় নীরব ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ না নিয়ে আন্দোলন বন্ধেচাপ প্রয়োগ করে। ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মন্তব্য করেন, কোটা আন্দোলনকারীরা সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, শিক্ষার্থীরা 'লিমিট ক্রস' করে যাচ্ছেন।

ক্ষমতাসীন দলের নেতা-মন্ত্রীদের হুমকি উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা তাদের দাবির পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে রাজপথ-রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করতে থাকেন। ১৪ জুলাই একই দাবিতে রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এ দিন গণভবনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, 'কোটার বিষয়ে আমার কিছু করার নেই। ...মামলার পর আদালত যে রায় দেন, এতে নির্বাহী বিভাগের কিছু করার নেই। আদালতেই সমাধান করতে হবে।' সংবাদ সম্মেলনে এক পর্যায়ে তিনি এ মন্তব্যও করেন যে, 'মুক্তিযোদ্ধার নাতি-পুতিরা পাবে না, তা হলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা চাকরি পাবে?' এ মন্তব্যের মাধ্যমে বাস্তবে তিনি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদেরই অবমাননা করেন।

এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে লাখ লাখ মানুষের রক্তে রঞ্জিত ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতক শক্তিদের সাথে তুলনা করায় মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার চেতনা যে প্রজন্মের বুকে আজও লালিত তা তারা সহজভাবে নেয়নি। এটা ছিল আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের কাছে আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। তাই বিদ্রুপের বাণ হেনে 'তুমি কে আমি কে— রাজাকার, রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে— স্বৈরাচার, স্বৈরাচার', 'চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার' স্লোগানে নিজেদের মর্যাদা রক্ষার্থেই সেদিন রাতে হল ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজপথে নেমে আসে। মেয়েরা হলের গেট ভেঙে রাস্তায় নেমে আসে। প্রধানমন্ত্রীর কটূক্তির জবাবে আন্দোলন শুধু আর কোটা সংস্কারের দাবিতে সীমাবদ্ধ থাকল না, স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল। রাতেই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। কয়েক জায়গায় ছাত্রলিগ হামলা করে।

পরের দিন দুপুরে আওয়ামি লিগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বলেন, 'এর জবাব দেওয়ার জন্য ছাত্রলিগ প্রস্তুত।' তার এ মন্তব্যের পরপরই দেখা গেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ছাত্রলিগ বহিরাগত সন্ত্রাসী ভাড়া করে এনে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করল। এমনকি নারী শিক্ষার্থীদের উপরও দফায় দফায় হামলা করা হল। প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী এ দিন আহত হয়। আহতরা ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নিতে গেলে সেখানেও হামলা চালানো হয়। চিকিৎসা নেওয়া অবস্থায় হাসপাতালে আক্রমণের মতো নজিরবিহীন ঘৃণ্য বর্বরতার উদাহরণ তৈরি করল ছাত্রলিগের সন্ত্রাসীরা।

১৬ জুলাই রংপুরের বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ শহিদ হন। এ দিন বিভিন্ন স্থানে ৬ জনকে হত্যা করা হয়। প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে সারা দেশ। সর্বস্তরের জনগণ নেমে আসে রাজপথে। 'সর্বাত্মক অবরোধ'-এর পর 'কমপ্লিট শাটডাউনে' সারা দেশ কার্যত অচল হয়ে যায়।

আওয়ামি ফ্যাসিস্ট সরকার নৃশংস আক্রমণে গণআন্দোলন দমনের পথে হেঁটেছে। সরকার পুরো রাষ্ট্রশক্তি ও তার দলীয় বাহিনীকে ছাত্র-জনতার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি ও ছাত্রলিগ-যুবলিগ-আওয়ামি লিগের সন্ত্রাসী বাহিনী ইতিমধ্যে কয়েক শত ছাত্র-জনতাকে হত্যা করেছে। পত্রিকার তথ্যমতে এ সংখ্যা ৫ শতাধিক হলেও প্রকৃত সংখ্যা এখনও অজানা। গুলিবিদ্ধ হয়ে চোখের আলো হারিয়েছেন ৫০ জনের অধিক। আহত ছয় হাজারেরও বেশি, যার বেশিরভাগই গুলিবিদ্ধ। গ্রেফতার করা হয়েছে প্রায় ১১ হাজার আন্দোলনকারীকে। ঢাকা ও বাইরের জেলাগুলোতে পাড়ায় পাড়ায় ব্লক রেইড করে গ্রেফতার অভিযান চালিয়েছে আওয়ামি লিগ সরকার।

পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি ও দলীয় সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়েও সরকার আন্দোলন দমাতে না পেরে কারফিউ জারি করেছে। সেনাবাহিনী নামিয়েছে। ইন্টারনেট ব্ল্যাক আউট করেছে। মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করেছে। ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো বন্ধকরে দিয়ে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে একতরফা সরকারি বক্তব্য প্রচার করেছে। তারপরও যতটুকু খবর এসেছে, ভিডিও চিত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতে গভীর বিস্ময় ও ক্রোধের সাথে মানুষ লক্ষ করেছে— নৃশংসতার সমস্ত অতীত নজিরকে হার মানিয়ে কী ঠাণ্ডা মাথায় পুলিশ গুলি করছে— কারও বুকে, কারও মাথায়। বারান্দায়, বাড়ির ছাদেও গুলি চালিয়ে শিশুদের হত্যা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত খবর পাওয়া গিয়েছে ৩২ জন শিশু হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে।

এত অল্প সময়ে কোনও আন্দোলনে এত মৃত্যু মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যতীত হয়নি। কী পাকিস্তান

পাঁচের পাতায় দেখুন

কাকে আড়াল করতে তদন্তে টালবাহানা

একের পাতার পর

আগবাড়িয়ে বলে দিয়েছেন, মৃতার পরিবার সিবিআই তদন্ত চাইলেও তাঁর আপত্তি নেই। তাঁর দলের দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক আবার জনরোষ এড়াতে অপরাধীকে 'এনকাউন্টার'-এর পক্ষেও সওয়াল করেছেন। চিকিৎসক-ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের তীব্র প্রতিবাদের সামনে সরকার মুখ বাঁচাতে হাসপাতালের সুপার ও হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত থানার এসিপি-কে বদলি করেছে, চরম অপদার্থতার নজির সৃষ্টিকারী শাসক দলের নেতাদের পেটোয়া হিসাবে পরিচিত প্রিন্সিপাল পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু এখনও চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধান, রোগী কল্যাণ সমিতি আলো করে বসে থাকা সরকারি দলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা স্বপদেই বর্তমান।

কলকাতার মৌলালি মোড় থেকে চিকিৎসক ও মানবাধিকার রক্ষা আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদ মিছিল। ১০ আগস্ট

মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুলিশের কর্তারা সকলেই নাকি প্রচণ্ড দুঃখিত! কিন্তু এমন 'দুঃখের' ঘটনা যাতে না ঘটতে না পারে সেটা দেখার যে দায়িত্ব তাঁদের ওপর ছিল, তা পালনে কী করেছেন তাঁরা? হাসপাতালের ভিতরের পরিস্থিতি যতটা অরাজক হলে এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব হয়, সে পরিস্থিতি তো তাঁদের অপদার্থতাতেই জাঁকিয়ে বসেছে! স্বাস্থ্য প্রশাসনকে পুরোপুরি দলীয় প্রশাসনে পরিণত করে যে সর্বনাশ এঁরা ডেকে এনেছেন, তার দায় স্বাস্থ্যকর্তারা নেবেন না কেন? খোদ মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্বে। তা সত্ত্বেও কী করে হাসপাতালগুলোতে মদের ঠেক, বহিরাগতদের নেশার আখড়া, দুষ্কৃতী-চক্র, দালাল রাজ এ ভাবে গভীরে শিকড় গেড়ে বসতে পারল? তিনি এর জবাব দেবেন না কেন?

ডাক্তারি ছাত্র, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা চাইছেন, বিচারবিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্বচ্ছ তদন্ত হোক। অথচ, সেই দাবি এড়িয়ে গিয়ে সিবিআই, এনকাউন্টার ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করে সরকারের শীর্ষ কর্তারা যে আসলে বিষয়টাকে ধামাচাপা দিতে চাইছেন তা পরিষ্কার। কে কী তদন্ত চাইবে, তার উপর কেন নির্ভর করবেন মুখ্যমন্ত্রী? তিনি নিজেই তো বিচারবিভাগীয় তদন্ত বা সিবিআই তদন্তের ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন! কেন কলেজ প্রশাসন এবং পুলিশের পক্ষ থেকে মৃতার বাবা-মা কে ফোন করে আত্মহত্যার কথা বলা হল? মৃতার শরীরের ভয়াবহ আঘাতের ধরন দেখে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা সকলেই একাধিক দুষ্কৃতীর জড়িত থাকার সম্ভাবনার কথা বলছেন। পুলিশ কমিশনার সেই সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত পরিচালনার বদলে জুনিয়র ডাক্তার ও ছাত্রদের উপরে, কেউ জড়িত থাকলে তার নাম জানানোর দায়িত্ব দিলেন কেন? তাঁর পুলিশের তবে কী কাজ? তাঁর চেয়ারটা কি শুধু অলঙ্কার? পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ মন্ত্রীকে তো জবাব দিতে হবে যে, গ্রেপ্তার হওয়া সিভিক ভলান্টিয়ার যে রকম প্রভাবশালী বলে সংবাদমাধ্যমেই দেখা যাচ্ছে, তা হতে পারল কী করে? যাদের মদতে তার এই রমরমা, সেই অদৃশ্য ক্ষমতাশালীকে চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার কোনও ইচ্ছা পুলিশের আছে কি? সমাজমাধ্যম এবং সংবাদমাধ্যমে ইঙ্গিত আসছে আর জি কর হাসপাতালের সাথে যুক্ত, সরকারের মন্ত্রীস্তরের ঘনিষ্ঠ বিশেষ কয়েকজনের কথা, যাদের এই নারকীয় ঘটনার সঙ্গে যোগ থাকার সন্দেহ উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কোনও বিশেষ প্রভাবশালী মহলের ঘনিষ্ঠ কারও অপরাধ চাপা দিতে তদন্তের রাশ টেনে ধরা তো এ দেশে রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। তাই বিচারবিভাগীয় তদন্ত, প্রতিদিন তদন্তের অগ্রগতি জানানো, সিসিটিভি ফুটেজ হাসপাতালের পিজিটিদের সামনে প্রকাশ করা, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের দেখানোর দাবি ক্রমাগত জোরদার হচ্ছে।

১০ আগস্ট দলের ডাকা প্রতিবাদ দিবসে মিছিল কলকাতার রাসবিহারী মোড় ও যাদবপুর

শ্যামবাজার মোড়ে শোকবেদিতে মাল্যদান। ১০ আগস্ট

প্রকৃত দোষীরা আদৌ শাস্তি পাবে কি না সময়ই বলবে। মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, কোনও শাসক দলই নিজেদের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের শাস্তি দেয় না। পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলে ১৯৮২-তে কোচবিহারের নার্স বর্ণালী দত্তকে তাঁর ঘরের মধ্যেই ধর্ষণ করে খুন করেছিল তৎকালীন শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। কারও শাস্তি হয়নি। ২০০১-এ এই আর জি কর হাসপাতালেই ডাক্তারি ছাত্র সৌমিত্র বিশ্বাস তৎকালীন শাসকদলের ছাত্র-নেতাদের পর্নোগ্রাফির চক্র ধরে ফেলে প্রতিবাদ করায় হোস্টেলেই খুন হয়ে যান। খুনিদের কোনও শাস্তি হয়নি। সিপিএম সরকারের আমলেই পুরুলিয়ার শিক্ষিকা শ্রাবণী খান নিজের বাড়িতে একদল দুষ্কৃতীর পাশবিক লালসার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। অভিযোগ ছিল শাসক দলের মদতপুষ্ট মদ্যপ বাহিনী এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। কারও কোনও শাস্তি হয়নি। একই ভাবে তৃণমূল সরকারের আমলে র‍্যাগিংয়ের শিকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যুর এক বছর পার হয়ে গেলেও এখনও বিচারই শুরু হয়নি। আর জি কর সহ সমস্ত সরকারি হাসপাতালে পর্নোগ্রাফি চক্র, নেশার ঠেক, মহিলা ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের নানা ভাবে হেনস্থা শ্লীলতাহানি প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। এই দুষ্কৃতীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাসকদলের অতি-প্রভাবশালীদের সঙ্গী-সাথী হওয়ায় থানায় কোনও অভিযোগ পর্যন্ত নথিভুক্ত হয় না। খুব বড় কিছু ঘটনা ঘটলে কিছুটা হইচই হয়, পুলিশ কিছুটা নাড়াচাড়া করে, তারপর সব চাপা পড়ে যায়। সরকারি হাসপাতালগুলোতে শাসক দলের মদতে বেশ কিছু বহিরাগত স্থায়ীভাবে বাস করেন। স্বাস্থ্য প্রশাসনের কর্তারা হয় পুরোপুরি দৃষ্টিহীন, না হলে ক্ষমতার পদলেহন করে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার লোভে চোখ বুজে থাকেন। পরিস্থিতি যে সত্যিই কতটা ভয়ানক, আর জি করের সাম্প্রতিক এই ঘটনা থেকে তা পরিষ্কার।

এক দিকে সমাজের মধ্যে গেড়ে বসে থাকা পুরুষতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি মেয়েদের ভোগের বস্তু হিসাবে দেখে। অন্য দিকে পর্নোগ্রাফি ও মদ-ড্রাগস-গাঁজা ইত্যাদির নেশা যৌনতা চরিতার্থ করার জন্য পাশবিক প্রবণতাকে মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দেয়। অথচ সরকারের মদতে মদ-মাদকের ঢালাও প্রসার চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস শাসক দল হিসাবে পাড়ায় পাড়ায় যে সব মস্তান বাহিনী, বাহুবলীদের পুষছে, তাদের অনেকেই এই চক্রের মাথা। হাজার অপরাধ করলেও যে তাদের কোনও শাস্তি হবে না— এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। এ জন্যই তারা এমন বেপরোয়া। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারও যে শাসক দলের মদতেই নিজের বাহুবলী ইমেজ বাড়িয়েছে তা সংবাদমাধ্যমেই দেখা যাচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, এখনও আড়ালে থেকে যাওয়া অপরাধীদের মাথার উপরেও সরকারের ওপরমহলের আশীর্বাদ আছে, এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

আর জি কর হাসপাতাল চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র। ৯ আগস্ট

আর জি কর সহ সমস্ত সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কাউন্সিল এবং স্বাস্থ্য প্রশাসনের যাঁরা কর্তা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের গদি লাভ ও রক্ষার প্রধান যোগ্যতা হল চোখ বুজে শাসক দলের দাসত্ব করা। এই গুণটি আছে বলেই দুর্নীতির ভুরি ভুরি অভিযোগ সত্ত্বেও আর জি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষ দু'বার বদলি হয়ে দু'বারই এক-দুই দিনের মধ্যে ওই হাসপাতালেই ফিরে এসেছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি-র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিণামে ডাক্তারি-নার্সিং ছাত্রছাত্রী ও চিকিৎসকদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার। বিষয়টা এখন মাত্রাছাড়া হয়েছে। আর জি করের বর্তমান ঘটনায় চিকিৎসক, ছাত্র, স্বাস্থ্যকর্মীদের ফেটে পড়া বিক্ষোভের মধ্যে লুকিয়ে আছে এইসব নানা ক্ষোভও।

আশার কথা দলমত নির্বিশেষে নানা পেশার নানা সামাজিক স্তরের মানুষ এই ঘটনার প্রতিবাদে সক্রিয় ভাবে রাস্তায় নেমেছেন। ৯ আগস্ট ঘটনার কথা জানা মাত্রই তাঁরা আর জি কর হাসপাতালে সমবেত হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠন এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস ছাড়াও চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, নার্সেস ইউনিটি সহ নানা সংগঠনের সদস্যরা বিক্ষোভে সামিল হন। এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে টালা থানায় ডেপুটেশন দিয়ে দ্রুত গ্রেপ্তার, বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও ছাত্রদের দাবি মেনে স্বচ্ছতার সাথে পোস্টমর্টেমের ভিডিওগ্রাফির দাবি জানানো হয়। সমস্ত মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি ও নার্সিং ছাত্র-ছাত্রী, ইন্টার্ন, জুনিয়র চিকিৎসকরা মিছিল করেন। মিছিল করেন সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম ও মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস। ১০ আগস্ট সারা রাজ্যে সমস্ত মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ও প্যারামেডিকেল কলেজে ধর্মঘটের ডাক দেয় এ আই ডি এস ও। কলকাতার আর জি কর সহ এনআরএস, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, এসএসকেএম, মেডিকেল কলেজে অবস্থান শুরু

আটের পাতায় দেখুন

জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিজয়

তিনের পাতার পর

আমল, কী স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে। আন্দোলনের গর্ভেই জন্ম এ দেশের। ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান সহ ছোট বড় অসংখ্য আন্দোলন এ দেশে হয়েছে। অত্যাচার-নির্যাতন তাতেও কম হয়নি। কিন্তু এত রক্তস্রোত, এত এত লাশের সারি পাড়ি দিতে হয়নি। সে দিক থেকে অতীতের সমস্ত স্বৈরশাসকের নৃশংসতাকেও হার মানিয়েছে আওয়ামি ফ্যাসিস্টসরকার। কিন্তু অকুতোভয় বীরের মিছিলের স্রোত থামেনি, দমে যায়নি ছাত্র-জনতা। নিভে যায়নি ক্ষোভের আগুন।

এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে

কোটা সংস্কারের দাবি থেকে যে স্ফুলিঙ্গের সূচনা তা একসময় দাবানলের রূপ নেয়। এ পর্যায়ে আন্দোলন আর শুধু ছাত্র আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকেনি, দাবিও আর কোটা সংস্কারে আবদ্ধ থাকেনি। আন্দোলন দমাতে নির্বিচার গুলি ও হত্যাকাণ্ডে সারা দেশ স্তম্ভিত, বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রাথমিক স্তব্ধতা-বিহ্বলতা কাটিয়ে, শোক ছাপিয়ে গণহত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়। প্রতিদিন আন্দোলনের শক্তি বাড়তে থাকে। অন্য দিকে বাধ্য হয়ে সরকার তড়িঘড়ি করে আদালত বসিয়ে কোটা সংস্কার করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। একই সাথে গুম-খুন, গণগ্রেফতার, আন্দোলনের সমন্বয়কদের হাসপাতাল থেকে ডিবি কার্যালয়ে আটকে রেখে তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করে বাধ্য করে বিবৃতি ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল গ্রহণ করে।

সর্বস্তরের জনগণ শিক্ষার্থীদের দাবির সাথে একাত্ম হয়ে রাজপথে নেমে আসে এ কথা ঠিক। কিন্তু মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভও তাকে রাস্তায় নামিয়েছে। গত ১৫ বছরে আওয়ামি লিগের ফ্যাসিস্ট শাসনের সময়ের অত্যাচার-নির্যাতন, গুম-খুন সামান্যতম প্রতিবাদের সমস্ত পথ রুদ্ধ করেছে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে পর পর তিনটি জাতীয় নির্বাচন হয়েছে— যেখানে জনগণ তার ম্যান্ডেট প্রকাশ করতে পারেনি। নির্বাচন ছিল সাজানো নাটক। গায়ের জোরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে আওয়ামি লিগ। এ ভাবে একতরফা ক্ষমতায় থাকার কারণে তারা দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে যা ইচ্ছে তা-ই করেছে। আর তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিরা। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে তারা হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছে। প্রভাব খাটিয়ে, পরিকল্পিতভাবে ব্যাঙ্কগুলো থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এই টাকা দেশের বাইরে পাচার করেছে। সিন্ডিকেটের কারণে, লুটপাট ও চাঁদাবাজির কারণে দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতিতে মানুষ জেরবার হয়েছে। বারবার ভুগেছে সাধারণ জনগণ। আর চোখের সামনে ধনী থেকে আরও ধনী হয়েছে একটি গোষ্ঠী। এ সবের ফলে দিনে দিনে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল— এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের ফলে তা বারুদের মতো বিস্ফোরিত হয়েছে। এ বারই প্রথম নয়, এই ছাত্ররা ২০২১ সালে নিরাপদ সড়কের আন্দোলনে নেমেছিল তাদের দুই বন্ধুকে বাসচাপা দিয়ে হত্যার প্রতিবাদে, যা জনতার ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে দিয়েছিল।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার সরকারি চক্রান্ত— 'তকমা দেওয়ার রাজনীতি'

এই ১৫ বছরব্যাপী শাসনে আওয়ামি লিগ যত বারই সংকটে পড়েছে, তত বারই সে আন্দোলনকারীদের জামায়াত-শিবির-জঙ্গিবাদের তকমা দিয়েছে, ধর্মান্ধ-সেকুলার দ্বন্দ্ব লাগিয়ে সংকট থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছে। দেশের মানবিক, উদার, গণতন্ত্রমনা মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে সে তার শাসন টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে।

এই আন্দোলন দমনেও সরকার দুই দিক থেকেই আক্রমণ করেছে। একদিকে সে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী ও দলীয় সন্ত্রাসী বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে, অন্য দিকে আন্দোলন আর ছাত্রদের হাতে নেই, আন্দোলনে 'বিএনপি-জামায়াত' ঢুকে পড়েছে— এই বলে আন্দোলনকারীদের স্বাধীনতা-বিরোধী অপশক্তি হিসেবে তকমা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আন্দোলনে যুক্ত গণতন্ত্রমনা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে। কতিপয় সরকারি ভবনে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য সামনে এনে দেখাতে চেয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, বিএনপি-জামায়াত নাশকতা করছে। এ ভাবে জনগণের সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করেছে, সরকারি দমন-পীড়নের পক্ষে জনমতকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে। অথচ পত্রিকায় সংবাদ এসেছে যে, মেট্রোরেলে আগুন দিয়েছে বাস মালিকরা, চট্টগ্রামে শ্রমিক লিগের নেতা সন্ত্রাসী ভাড়া করে বিআরটিসির বাস পুড়িয়ে দিয়েছে, এই অভিযোগে সে গ্রেফতারও হয়েছে। এই আন্দোলনে মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে সকল ছাত্র-জনতাই সামিল হয়েছে। একত্রে লড়েছে, প্রাণ দিয়েছে। কোনও ভেদাভেদ ছিল না। শেখ হাসিনা পালাতে বাধ্য হওয়ায় ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামি লিগের লোকজন ও স্বার্থান্বেষী মহল আন্দোলন কালিমালিপ্ত করার জন্য সংখ্যালঘুদের কিছু ধর্মস্থানে হামলা করেছে, কোথাও কোথাও লুটপাট করেছে। কিন্তু সাথে সাথেই আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা এই চক্রান্ত রুখে দিয়েছে।

তাই বহুল ব্যবহৃত এই কৌশল এ বার আর কাজে লাগেনি। সরকারের সমস্ত গুমর ফাঁস হয়ে গিয়েছে জনগণের কাছে, দেশবাসীর কাছে। তাই আন্দোলন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। বরং প্রতিদিন জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহণ বেড়েছে। দেশের বিশিষ্ট অধ্যাপক-শিক্ষক, অভিনয় শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা, কণ্ঠশিল্পী, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক সহ বিভিন্ন অংশের মানুষ রাজপথে নেমে এসেছে। নিজ নিজ জায়গা থেকে সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষার্থী-জনতার পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন বেগবান করেছে।

দফা এক, দাবি এক— খুনি হাসিনার পদত্যাগ

১৫ জুলাই আবু সাঈদ সহ ৬ জন আন্দোলনকারী শহিদ হন। ১৬ জুলাই বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদবিরোধী বামমোর্চা ও বাংলাদেশ জাসদ— সম্মিলিত বিবৃতিতে শেখ হাসিনার ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে পদত্যাগের দাবি তোলে।

১৭ জুলাই থেকে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে এবং ১৯ জুলাই থেকে কারফিউ ঘোষণা করে দেশের মানুষের উপর এক নির্মম আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। পাড়ায় পাড়ায় 'ব্লক রেইড' দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়। ২৬ জুলাই সকাল ১১টায় সংস্কৃতিকর্মীরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে 'গানের মিছিল' বের করে। বিকেলে বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদবিরোধী বামমোর্চা ও বাংলাদেশ জাসদ সম্মিলিতভাবে শহিদদের স্মরণে 'শোকমিছিল' বের করে। ২৭ জুলাই সকালে নারীদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ২৯ জুলাই দেশব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ, ৩০ জুলাই মুখ ও চোখে লাল কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ ও প্রোফাইল লাল করার কর্মসূচি দেয়। এই কর্মসূচিতে সারা দেশের ব্যাপক মানুষ অংশগ্রহণ করেন, এমনকি বিভিন্ন সেক্টরের পরিচিত তারকারাও এতে অংশ নেন। ৩১ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে অনুষ্ঠিত হয় 'মার্চ ফর জাস্টিস'। সেদিন হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে আন্দোলনকারীদের পুলিশ গ্রেফতার করতে চাইলে উচ্চ আদালতের আইনজীবীরা পুলিশকে বাধা দেন। ১ আগস্ট 'রিমেম্বারিং দি হিরোস' শিরোনামে সারা দেশে শহিদদের স্মরণ করা হয়। ২ আগস্ট সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

২ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত ছাত্র-জনতার দ্রোহযাত্রার পূর্বের বিরাট সমাবেশ থেকে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ শেখ হাসিনার পদত্যাগের সুস্পষ্ট দাবি তোলেন। এই সমাবেশে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার দশ হাজারেরও বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এর মাধ্যমে শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসনের হাত থেকে মুক্তির যে আকুতি জনগণের মনে গুমরে গুমরে কাঁদছিল তা ভাষা পায়। পরদিন শহিদ মিনারের লাখো মানুষের সমাবেশ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফা দাবি তোলে। এই দাবিতে তখন গোটা দেশের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এক দফা দাবিতে ৪ আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করা হয়। ৬ আগস্ট থেকে ঘোষণা করা হয় 'লং মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি। ৪ আগস্ট অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিন সারা দেশে পুলিশ ও আওয়ামি লিগ সন্ত্রাসীদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে 'ঢাকা মার্চ' একদিন এগিয়ে ৫ আগস্ট নিয়ে আসা হয়।

৫ আগস্ট, ২০২৪, সোমবার। বেলা একটু বাড়ার সাথে সাথে ঢাকামুখী বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে লাখ লাখ মানুষের মিছিলের স্রোত শহিদ মিনার ও গণভবন অভিমুখে রওনা দেয়। এ জোয়ার ঠেকানোর কোনও উপায় রাষ্ট্রশক্তির ছিল না। গণঅভ্যুত্থানের কাছে রাষ্ট্রশক্তি পরাজিত হয়। দুপুরের মধ্যেই শেখ হাসিনা বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করে গণভবন থেকে পালিয়ে দেশ ছাড়েন।

বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন এই আন্দোলনে। বিভিন্ন শ্রেণিপেশার অসংখ্য মানুষ যুক্ত হয়েছিলেন এই আন্দোলনে। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ লুকিয়ে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক' ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনে ছিল বহুদিন ধরে। আন্দোলনের সময় তারা সাহসী ভূমিকা পালন করেন। ১৭ জুলাই তারা শাহবাগ থানা থেকে দুই আন্দোলনকারীকে বের করে আনেন। জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকরা মিছিলে নামেন। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা!

২৯ জুলাই, যখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে ডিবি অফিসে আটক করে রাখা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে জোর করে বক্তব্য নেওয়া হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দেখা করতে গেলেও তাদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না, সেই সময়ে উচ্চ আদালতের আইনজীবী আইনুন্নাহার লিপি ও মানজুর আল মতিন 'ছয় সমন্বয়কের আটকাদেশের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে ও আন্দোলনে গুলি না করার নির্দেশ চেয়ে' একটি রিট আবেদন করেন। পরবর্তীতে এই ছয় সমন্বয়ককে ছেড়ে দেওয়া হয় আর 'গুলি না করার নির্দেশ চেয়ে' রিটটি খারিজ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচিতে সারা দেশের অসংখ্য আইনজীবী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পক্ষে দাঁড়ান। হত্যার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য নাগরিকদের পক্ষ থেকে গঠন করা হয় 'গণতদন্ত কমিটি'।

বিভিন্ন মাধ্যমে কর্মরত অভিনয়শিল্পী, পরিচালক, কলাকুশলীরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। 'দৃশ্যমাধ্যম শিল্পীসমাজ' নামে তারা এই প্লাটফর্মে এখনও সক্রিয়। আন্দোলনে নেমেছিলেন চারুকলার শিল্পীরাও। ঢাকা শহরের রিকশাচালকরা এই আন্দোলনে প্রায় সংগঠিত ভূমিকা রাখেন। তারা শুধু রিকশা মিছিলই আয়োজন করেননি, কারফিউ-এর সময় ও অন্যান্য সময় পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে আন্দোলনকারীদের গন্তব্যে পৌঁছানোর কাজটি করেছেন তারা সুচারুভাবে। তাদের প্রত্যেকে ইশারার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করতেন ও বুঝে নিতেন সামনে কোনও বিপদ আছে কি না। ছাত্র আন্দোলন থেকে এই আন্দোলন যখন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়, তখন এই আন্দোলনে দোকান কর্মচারী, ছোট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও খেটে খাওয়া অনেক মানুষ যুক্ত হয়েছেন, গুলি খেয়েছেন, মৃত্যুবরণও করেছেন।

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময় ঃ 'এখানে রাজনৈতিক আলাপ চলবে'

একটি দেওয়াল লিখন ফেসবুকে অনেকেরই চোখে পড়েছে। সেখানে 'এখানে রাজনৈতিক আলাপ নিষিদ্ধ।' এই কথাটি লিখে, 'নিষিদ্ধ' শব্দটি কেটে 'চলবে' শব্দটি লেখা হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের আগে প্রায় সকল চায়ের দোকানে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 'রাজনৈতিক আলাপ নিষিদ্ধ' কথাটি লেখা ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। কেউ রাজনৈতিক আলাপ অনুমোদন করতেন না। কারণ কোনও বিরুদ্ধ মত প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা বড় ঝুঁকি ছিল। কিন্তু আজকের

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

আসুন, স্রোতের বিরুদ্ধে হাঁটি

১১ই আগস্ট। ১৯০৮ সালে আঠেরো বছরের ক্ষুদিরাম বসুকে এই দিন ফাঁসি দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসক। ফাঁসির মঞ্চের দিকে তেজোদৃপ্ত পায়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন এই অগ্নিকিশোর। তার অসমসাহসী আত্মবলিদান জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষের লক্ষ মানুষের হৃদয়। তার তিন বছর পরে, কটকের স্কুলে বন্ধুদের নিয়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন পালন করেছিলেন বছর দশেকের আরেক কিশোর। তার নাম সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, ভগৎ সিং-রা চেয়েছিলেন এক সত্যিকারের স্বাধীন, শোষণমুক্ত ভারতবর্ষ, যেখানে প্রতিটি মানুষ মর্যাদায় মাথা উঁচু করে বাঁচবে। অথচ এই স্মরণীয় দিনটির প্রাক্কালে, স্বাধীনতার আটাত্তর বছর পূর্তির ক'দিন আগে, এই বাংলার বুকে ঘটে গেল আর জি কর হাসপাতালের অভাবনীয় নৃশংস ঘটনা। শহর কলকাতার একটি প্রথম সারির সরকারি হাসপাতালের অন ডিউটি ডাক্তার, এক মেধাবী সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল তরুণীর পৈশাচিক ধর্ষণ ও হত্যা অনেকগুলো প্রশ্ন তুলে দিল। সমাজে মেয়েদের চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা, সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অপদার্থতা ও গাফিলতির নিন্দার কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। সবার আগে অপরাধীর বিচার চাই, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আমরা যারা সাধারণ নাগরিক, তারা কি নিজেদের কাজটুকু করছি বা করেছি ঠিক মতো? খুন ধর্ষণের ঘটনা কেন রোজের হেডলাইনে পরিণত হচ্ছে আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজে? আমরা কি সন্তানের সামনে, নবীন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে পারছি কোনও অনুসরণীয় চরিত্র, মূল্যবোধ? যে সমাজ মানুষকে এমন নৃশংস বর্বরে পরিণত করছে, সেখানে বাস করে আমাদের কি কিছুই করার ছিল না?

১১ আগস্টের সকালে দেখা যায়, কলকাতার রাস্তায়, পাড়ার মোড়ে, মফস্বলের বাজারে হাটে ক্ষুদিরামের ছবিতে মালা দিচ্ছে একদল তরুণ-তরুণী। আপনাকে তারা ডাকবে— 'আসুন ছবিতে মালা দিন, ক্ষুদিরামকে শ্রদ্ধা জানান।' হয়তো বাজার করার ব্যস্ততায়, সংসারের পাঁচটা ঝামেলায় আপনি 'ব্যস্ত আছি' বলে এড়িয়ে যাবেন, হয়তো এগিয়ে যেতে গিয়েও নানা হিসেবি চিন্তা আপনাকে থামিয়ে দেবে। হয়তো একটু থেমে একমুঠো ফুল আপনি রাখবেন ক্ষুদিরামের শহিদ বেদিতে।

এদের আপনি প্রায়ই দেখেন। গলিতে, রাজপথে, আপনার ঘরের দরজায়। এরা আসে, আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চায় ২৯ জুলাই, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১১ আগস্ট। মনে করিয়ে দেয় বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা, সূর্য সেনের কথা। ২৩ জানুয়ারি সকালে যখন প্রায় সর্বত্র পিকনিকের মেজাজে নেতাজি-উৎসব চলে, তখন এই নাছোড়বান্দা ছেলেমেয়েগুলো আপনার হাতে ধরিয়ে দেয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি, ব্যাজ। ছবির তলায় তাঁর উদ্ধৃতি— অন্যায়ের সাথে যে আপস করে, অত্যাচার দেখলে যে প্রতিবাদ করে না সেও সমান অপরাধী। নিজের মতো করে নিজের জগতে ডুবে থাকা, ক্রমশ একা হয়ে যাওয়া এই পৃথিবীতে অন্য এক আলো-পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছে এই উজ্জ্বল তরুণেরা, হৃদয়ে গেঁথে নিচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনের, নবজাগরণের মনীষীদের জীবন, তাঁদের মূল্যবোধ। সমাজে অন্যায় অত্যাচার হলেই আপনি বিক্ষোভে মিছিলে প্রতিবাদে পাবেন এদের, যে মিছিল যে বিক্ষোভ দেখে হয়তো আপনি যানজটে আটকে পড়া বাসে বসে বিরক্ত হয়েছেন। যে প্রতিবাদে পা মেলাতে গিয়েও কোনও এক সাবধানী মন আপনাকে পেছনে টেনে ধরেছে।

আজ ভেবে দেখার দিন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করার দিন। যতবার আমি আপনি এদের এড়িয়ে গেছি, যতবার নিজে সামিল হইনি বা সন্তানকে বাধা দিয়েছি এমন উদ্যোগে সামিল হতে, ততবার সমাজে একটি মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে বাধা দিয়েছি আমরাও, বপন করেছি আত্মকেন্দ্রিকতার বীজ। মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে, ব্লু ফিল্ম দেখিয়ে, অপসংস্কৃতির জোয়ারে মাতিয়ে আমাদের শিরদাঁড়াকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চেয়েছে শাসক, আমরা নিষ্ক্রিয় থেকে সেই ফাঁদে পা দিয়েছি। যতবার সন্তানকে নিজের বৃত্তের বাইরে, কোচিং কেরিয়ার কম্পিটিশনের বাইরে কিছু ভাবতে দিচ্ছি না, এই অমানুষ তৈরির প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হয়ে থাকছি আমরাও।

বছরখানেক আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা স্বপ্নদীপের স্বপ্নগুলো হস্টেলের চারতলা থেকে আছড়ে পড়েছিল মাটিতে। সেই থেঁতলে যাওয়া দেহ দেখে আমরা শিউরে উঠেছি, বিনিদ্র রাতে ঘুমন্ত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। আজ যখন অনেক বড় ডাক্তার হতে চাওয়া, বহু পরিশ্রমে ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জন করা সুস্থ-সবল মেয়েটির ক্ষতবিক্ষত দেহ চোখের সামনে ভেসে উঠছে, আমরা একইভাবে শিউরে উঠছি। মেয়েটির মর্মান্তিক মৃত্যুযন্ত্রণা, অসহায় চিৎকার ভেবে নিজেদের শ্বাসরোধ হয়ে আসছে বারবার। আমাদের সন্তান, আমাদের আপনজনের মুখ মনে করে এক হিমশীতল আতঙ্ক গ্রাস করছে আমাদের। কিন্তু এমন করে বাঁচতে পারব না, বাঁচাতে পারব না প্রাণপ্রিয় সন্তানকে। বানতলা-সুটিয়া- কামদুনি-পার্ক স্ট্রিট-আর জি কর হয়ে খুনি-ধর্ষক নিঃশ্বাস ফেলবে আমাদের পাশের পাড়ায়, হয়তো পাশের বাড়িতেই। যদি সত্যিই এই অসুস্থ সমাজের পরিবর্তন চাই, তা হলে আজ অন্তত স্রোতের বিরুদ্ধে হাঁটি। বিকল্প সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার লড়াইতে সর্বশক্তি নিয়ে পাশে দাঁড়াই। না হলে অদূর ভবিষ্যতে 'মানুষ' নামক নিশ্চিহ্ন প্রজাতির ফসিল সংরক্ষণ করতে হবে মিউজিয়ামে। আজও যদি জেগে ঘুমিয়ে থাকি, সেদিন ইতিহাস দায়ী করবে আমাদেরও। শূন্যতার অতলে তলিয়ে যেতে যেতে সেদিন যেন বলতে না হয়—

'আমি জানি এই ধ্বংসের দায় ভাগে /আমরা দুজনে সমান অংশীদার। অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে/ আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।'

সূর্যস্নাতা সেন, দমদম

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে

আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক খুনের ঘটনায় শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে ১১ আগস্ট এক বিবৃতিতে প্রশ্ন তোলা হয়— হাসপাতালে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব যাঁদের, সেই কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন তাঁদের দায়িত্ব স্বীকার করবেন না কেন? রাজ্যের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী, পরিজন— সকলকে সুরক্ষিত রাখার দায় যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর, তিনি সেই দায় গ্রহণ করবেন না কেন?

এ দিনই মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো এক চিঠিতে মঞ্চের পক্ষ থেকে হাসপাতালগুলিতে দালাল ও মাফিয়া চক্রের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলে বলা হয়। এই চক্র যে শাসক দলের কিছু নেতা-কর্মী এবং প্রশাসনের একটি অংশের মদতেই গড়ে উঠেছে সে কথা উল্লেখ করা হয় এবং এদের একটি অংশই যে রাজ্য জুড়ে লুটেরা ও ধর্ষকে পরিণত হয়েছে চিঠিতে তাও উল্লেখ করা হয়। পুলিশ এবং প্রশাসনের একটি অংশ যারা এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চালাতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করা হয়। হাসপাতালগুলি চিকিৎসক, নার্স ও শিক্ষার্থীদের পৃথক বিশ্রাম কক্ষের দাবি অবিলম্বে মেটানোর কথা বলা হয়।

রাজ্যের শাসক দলের অন্যতম প্রধান নেতা যে ভাবে অপরাধীদের এনকাউন্টার করার অধিকার ও সংসদে সে জন্য বিল আনার প্রস্তাব দিয়েছেন, তার তীব্র প্রতিবাদ করে মঞ্চের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গণতন্ত্রে এমন দাবি মানা যায় না। মঞ্চের পক্ষ থেকে ১৩ আগস্ট শ্যামবাজার নেতাজি মূর্তি থেকে আর জি করের গেট পর্যন্ত এক 'নাগরিক সমাজের ধিক্কার পদযাত্রা'য় মীরাতুন নাহার, সুজাত ভদ্র, পার্থসারথি সেনগুপ্ত, অপর্ণা সেন, সোহিনী সেনগুপ্ত, পবিত্র গুপ্ত, পল্লব কীর্তনিয়া, অরুণাভ সেনগুপ্ত, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, সান্টু গুপ্ত, তরুণ মণ্ডল, তরুণকান্তি নস্কর সহ বহু মানুষ সামিল হন।

মোটরভ্যান চালকদের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন

৩০ জুলাই বারাসাতের বিদ্যাসাগর হলে অনুষ্ঠিত হল এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ষষ্ঠ সম্মেলন। সভাপতিত্ব করেন অজয় বাইন। ইউনিয়নের জেলা সহ-সম্পাদক গৌতম দাস, নদিয়া জেলা সভাপতি ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য যথাক্রমে আমির হোসেন ও তাপস পাল বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি, এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। সম্মেলন পরিচালনা করেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত সাহা। কমরেড গৌতম দাসকে সভাপতি ও কমরেড মণ্ডলকে সম্পাদক করে জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়। এরপর মিছিল করে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। প্রতিনিধি দল আরটিও-কে স্মারকলিপি দেন।

জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির বিজয়

পাঁচের পাতার পর

বাংলাদেশে এক নতুন ভোর এনেছে এই গণঅভ্যুত্থান। সবাই আজ বুঝতে চাইছেন, পথ খুঁজছেন। আর যেন মত প্রকাশের অধিকার বাধাগ্রস্ত না হয়, স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়। এটা প্রায় সকলের মনের আকাঙ্খা এবং এ ব্যাপারে সকলেই একটা রাস্তা পেতে চাইছেন। এটাও দেখা গেছে যে, জনগণের এই আকাঙ্খা কোনও প্রতিষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির দিকে যায়নি। যে দলগুলো বিভিন্ন সময় দেশ শাসন করেছে, তারা জনগণের আস্থার জায়গায় নেই। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। প্রচলিত বড় বড় দলকে, তাদের রাজনীতিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে এই সময়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাঠামোর সংস্কার কী হতে পারে, এই আলোচনাগুলো প্রধান হয়ে আসছে।

আওয়ামি লিগের ফ্যাসিস্ট শাসনের পতন, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদের সংগ্রাম বেগবান করুন

শেখ হাসিনার পদত্যাগের মধ্য দিয়ে আওয়ামি লিগের ফ্যাসিস্ট শাসনের পতন হয়েছে মাত্র। এটা এই গণঅভ্যুত্থানের প্রাথমিক বিজয় নিঃসন্দেহে। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, অতীতেও এ দেশে বড় বড় আন্দোলন হয়েছে, গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি, মানুষ অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা থেকে সকল প্রকার বৈষম্য ও বেকারত্বের জন্ম, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তার অবসান হয়নি, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর পতন হয়নি। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার জন্ম দেয়। ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণমূলক চরিত্রের কারণে এই রাষ্ট্র যথার্থ গণতান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠে না। শোষণের প্রয়োজনে ক্রমাগত প্রচলিত ছিটেফোঁটা গণতান্ত্রিক অধিকারও হরণ করে। ফলে ছাত্র-জনতার এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে বৈষম্যবিরোধী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা ধ্বনিত হচ্ছে, তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে, পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

বাম গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে গণআন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। রাজনৈতিক ভাবে সচেতন, সংঘবদ্ধ, নৈতিক শক্তিতে বলিয়ান এই গণআন্দোলনই গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও রক্ষার একমাত্র গ্যারান্টি।

দেশ জুড়ে ‘কর্পোরেট হটাও’ দিবস পালন করল এস কে এম

কৃষিক্ষেত্রে কর্পোরেট পুঁজিগোষ্ঠীর অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এর ফলে কৃষক শোষণ ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর বিরুদ্ধে সংযুক্ত কিসান মোর্চার আহ্বানে দেশ জুড়ে ৯ আগস্ট ‘কর্পোরেট হটাও’ দিবস পালন করে এআইকেকেএমএস। এ দিন গোটা দেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গেও সংগঠনের পক্ষ থেকে অসংখ্য জায়গায় কৃষক-খেতমজুরদের সংগঠিত করে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন, প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে গ্রামে, ব্লকে ব্লকে হাজার হাজার কৃষক-খেতমজুর কর্পোরেট বিরোধী স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

বহুজাতিক কর্পোরেট কোম্পানিগুলির স্বার্থে ১৯৯০ সালে মনমোহন সিং সরকারের আমলে সাম্রাজ্যবাদী উদার অর্থনীতি গ্রহণ করা হয়। শুরু হয় কৃষিক্ষেত্রে কর্পোরেট শোষণের থাবা। কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি কমানো, চুক্তি চাষের প্রবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে কর্পোরেট পুঁজিকে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে। বিজেপি সরকার এই নীতিকে আরও বেগবান করে। ২০২০ সালে করোনা কালে সংসদে তিনটি কালা কৃষি আইন পাস করিয়ে দেশের কৃষিক্ষেত্রটি পুরোপুরি কর্পোরেটের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন তা রুখে দেয়। ৭৫০ জন কৃষকের আত্মবলিদানের মূল্যে এই আন্দোলন বিজেপি সরকারকে বাধ্য করে ওই তিনটি কালা কৃষি আইন বাতিল করতে।

আন্দোলনের চাপে সরকার সাময়িক পিছু হটলেও কর্পোরেট স্বার্থরক্ষার নীতি থেকে তারা সরে আসেনি। নানা সময়ে কোটি কোটি টাকা ব্যাংকঋণ মকুব করে দেওয়া, নানা ক্ষেত্রে করছাড় ইত্যাদি উপায়ে তারা কর্পোরেট কোম্পানিগুলির সেবা করে চলেছে। এবার কেন্দ্রীয় বাজেটেও তা দেখা গেছে। বাজেটে সারে ভর্তুকি কমানো হয়েছে, কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প এনরেগা-তে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। বাস্তবে কৃষিক্ষেত্রের জন্য কিছুই দেওয়া হয়নি।

কর্পোরেট বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর করতে ২৩ সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের ২২টি রাজ্য থেকে কৃষক ও খেতমজুররা এ আই এ কে এম এস-এর উদ্যোগে নয়া দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে এক মহাসমাবেশে যোগ দেবেন। এই সমাবেশে এস কে এম-এর কয়েকজন সর্বভারতীয় নেতাকেও আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংসদে বিরোধী দাবিপত্র পেশ কিসান মোর্চার

সংযুক্ত কিসান মোর্চার দশ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল ৬ আগস্ট সংসদ চত্বরে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর কাছে ১৭ দফা দাবিপত্র পেশ করেন।

ফসলের সরকারি সংগ্রহ নিশ্চিত করার সাথে সাথে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য চাষের খরচের দেড়গুণ করা এবং কৃষককে ঋণমুক্ত করার বিষয়ে দুটি বিল সংসদে উত্থাপনের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। বিরোধী দলনেতা বিলগুলি আনা এবং সে ব্যাপারে যথাসাধ্য ভূমিকা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিনিধিদল তাঁকে অনুরোধ করেন, যে রাজ্যগুলিতে অ-বিজেপি ছাড়া দলগুলির সরকার আছে, সেখানে বিধানসভায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের পক্ষে প্রস্তাব পাশ করানো হোক ও তা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হোক।

তাঁরা আরও বলেন, কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে লড়ছেন চাষিরা। চাষিরা চান তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে যেন মর্যাদা দেওয়া হয় ও রূপায়িত করা হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন বলবীর সিং রাজেওয়াল, সত্যবান, প্রেম সিং গেহলট, হান্নান মোল্লা, রামিন্দর সিং তাজিন্দর সিং ভির্ক, দর্শন পাল, সুনীলম, রঞ্জন রামচন্দ্র ক্ষীরসাগর, অভীক সাহা।

মহান এঙ্গেলসের শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

এর ফলে পুরনো শান্তিপূর্ণ ও সুস্থির অবস্থার অবসান ঘটল। উৎপাদনের এই সংগঠন যেখানেই ও শিল্পের যে শাখাতেই প্রবর্তিত হল, সেখানেই উৎপাদনের অন্য কোনও পদ্ধতিকে সে বরদাস্ত করল না।

শ্রমক্ষেত্র একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হল। বিরাট বিরাট ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং তার পরে পরেই সেই সমস্ত দেশে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে বাজার বহুগুণ বৃদ্ধি পেল এবং হস্তশিল্পের কারখানায় রূপান্তর ত্বরান্বিত করল। একটা বিশেষ অঞ্চলের বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যেই কেবল যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকল না, স্থানীয় স্তরের লড়াই থেকে সৃষ্টি হল জাতীয় স্তরের সংঘর্ষ— সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাণিজ্য-যুদ্ধ।

শেষ পর্যন্ত, আধুনিক শিল্প এবং বিশ্ব বাজারের উন্মোচনে এই সংগ্রাম হয়ে উঠল বিশ্বজনীন এবং একই সঙ্গে এতটাই বিষাক্ত যা ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। এক একজন পুঁজিপতি তথা একটা গোটা শিল্প ও একটা দেশেরও অস্তিত্ব থাকা না-থাকার বিষয়টা এখন নির্ধারিত হতে থাকল উৎপাদনের স্বাভাবিক বা কৃত্রিম পরিস্থিতির সুবিধার দ্বারা। এই লড়াইয়ে যে হেরে গেল, নির্দয়ভাবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। এটা হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তির অস্তিত্বরক্ষার সেই ডারউইনীয় সংগ্রাম; শুধু তার ক্ষেত্রটা স্থানান্তরিত হল প্রকৃতি থেকে সমাজে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হল চূড়ান্ত রকমের হিংসা। অস্তিত্বের যে শর্তগুলি প্রাণীজগতের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, সেগুলিই যেন হয়ে দাঁড়াল মানবজাতির বিকাশের শেষ কথা। সমাজীকৃত উৎপাদনের সাথে পুঁজিবাদী দখলদারির বিরোধ এখন এক একটা কারখানায় উৎপাদনের সংগঠন ও সাধারণভাবে সমাজ অভ্যন্তরে উৎপাদনের নৈরাজ্যের মধ্যে বিরোধের রূপে প্রকাশ পেল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি একেবারে উদ্ভব থেকেই অন্তর্নিহিত এই দুই ধরনের বিরোধ সঙ্গে নিয়েই এগোচ্ছে। ওই ‘দুষ্ট চক্র’ থেকে তা কখনওই বেরিয়ে আসতে পারেনি। ফ্যুরিয়ে অনেক দিন আগেই এই সত্য উদঘাটন করেছেন। অবশ্য, ফ্যুরিয়ে তাঁর সময়ে যেটা দেখে যেতে পারেননি তা হল, এই চক্র ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে; গ্রহপুঞ্জের গতির মতোই এই চক্রের গতিও ক্রমেই আরও সর্পিল হয়ে কেন্দ্রের দিকে এগুচ্ছে এবং একটা সময় কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষে তার বিনাশ অনিবার্য। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অমোঘ শক্তি বিপুল অংশের মানুষকে আরও বেশি বেশি করে পুরোপুরি সর্বহারায় পরিণত করছে এবং এই ব্যাপক সর্বহারা জনগণই শেষপর্যন্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবে। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের অমোঘ শক্তিতেই আধুনিক শিল্পে যন্ত্রের সীমাহীন উন্নয়ন পরিণত হচ্ছে এক আবশ্যিক নিয়মে, যে নিয়ম প্রত্যেক শিল্পপতিকে বাধ্য করছে তার তার যন্ত্রকে ক্রমাগত আরও উন্নত করতে। অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য।

কিন্তু, যন্ত্রের উন্নয়ন মানুষের শ্রমকে অনাবশ্যক করে তুলছে। যন্ত্রের প্রবর্তন এবং তার সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ যদি হয় মুষ্টিমেয় মেশিন-শ্রমিকের দ্বারা লক্ষ লক্ষ কায়িক শ্রমিকের কর্মচ্যুতি, তা হলে যন্ত্রের উন্নতির অর্থ হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে যন্ত্রে কাজ করা শ্রমিকদেরও অপসারণ। পরিণামে এর অর্থ দাঁড়ায় পুঁজির গড়পড়তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদল সহজপ্রাপ্য বাড়তি মজুরি-শ্রমিক সৃষ্টি করা— ১৮৪৫ সালে যাকে আমি বলেছিলাম শিল্পের জন্য একটা পরিপূর্ণ মজুত বাহিনী গড়ে তোলা, শিল্পে কাজের চাপ বাড়লে এই বাহিনীকে যেমন কাজে লাগানো যাবে, তেমনি শিল্পে অনিবার্য ধস নেমে এলে রাস্তায় ছুঁড়েও ফেলে দেওয়া যাবে। এরা পুঁজির বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত শ্রমিকশ্রেণির কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া এক নিরন্তর গুরুভার, পুঁজির স্বার্থে শ্রমিকদের মজুরির হার কমিয়ে রাখতে পারার মতো এক নিয়ন্ত্রক। এইভাবে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, মার্ক্সের ভাষায়, সেখানে যন্ত্রই হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুঁজির হাতে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, শ্রমের যন্ত্র প্রতিনিয়ত শ্রমিকের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় তার জীবিকা নির্বাহের উপায়। যেটা শ্রমিকই তৈরি করেছে, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিককে অধীনস্থ করার হাতিয়ার। এর ফলে যা ঘটে, সেটা হল শ্রমের হাতিয়ারের সীমিত ব্যবহারের পথ ধরে শুরু থেকেই একইসাথে শ্রম শক্তির চূড়ান্ত বেপরোয়া অপচয় ঘটতে থাকে। যে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের কাজ করতে হয় তার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় লুণ্ঠন। শ্রমের সময়কে সংক্ষিপ্ত করার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার যে যন্ত্র, তা পরিণত হয় শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রতিটি মুহূর্তকে মালিকের হাতে তুলে দিয়ে তার পুঁজির মূল্য বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অব্যর্থ উপায়ে। এই ভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেটা ঘটে, তা হল, কিছু মানুষের বাড়তি কাজের বোঝা বাকিদের কর্মহীনতার প্রাথমিক শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক শিল্প যা নতুন নতুন ক্রেতার খোঁজে গোটা বিশ্বে ছুটে বেড়ায়, তা দেশের অভ্যন্তরে বেশির ভাগ মানুষকে অর্ধভুক্ত অভুক্ত অবস্থার শেষ ধাপে ঠেলে দিয়ে তাদের ক্রয়ক্ষমতাকে একেবারে নিঃশেষ করে দেয় এবং এ ভাবে তার নিজের দেশীয় বাজারকে ধ্বংস করে।

‘পুঁজির পুঞ্জিভবনের ব্যাপ্তি ও শক্তির সাথে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসমষ্টির, বা শিল্পের মজুত বাহিনীর ভারসাম্য যে নিয়মের দ্বারা সর্বদা রক্ষিত হয়, সেই নিয়ম শ্রমিককে পুঁজির সঙ্গে বেঁধে রাখে প্রমিথিউসকে যত শক্ত করে ভালকানের কীলক দিয়ে পাহাড়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তার চেয়েও অনেক বেশি শক্ত করে। এই অবস্থায় পুঁজি সঞ্চয়ের পাশাপাশি দুঃখদুর্দশারও সঞ্চয় ঘটে। সে কারণে, এক মেরুতে যখন সম্পদ জমা হয়, তখন একই সময়ে বিপরীত মেরুতে, অর্থাৎ যে শ্রেণি স্বীয় উৎপন্নকে উৎপাদন করছে পুঁজির আকারে, তাদের জীবনে জমা হতে থাকে দুঃখ-দুর্দশা, শ্রম-যন্ত্রণা, দাসত্ব, অজ্ঞতা, পাশবিকতা, নৈতিক অধঃপতন” (মার্ক্সের ক্যাপিটাল)। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের অন্য কোনও রকম বণ্টন আশা করা, আর বিদ্যুৎবাহী তার (ইলেকট্রোডস) যতক্ষণ ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত আছে, ততক্ষণ সে অ্যাসিড মেশানো জলকে বিশ্লিষ্ট করবে না, তার ধনাত্মক প্রান্ত থেকে অক্সিজেন, ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে হাইড্রোজেন ছাড়বে না— এমনটা আশা করা একই কথা।

আমরা দেখেছি, সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্যের কারণে আধুনিক শিল্পযন্ত্রের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীলতা এক আবশ্যিক নিয়মে পরিণত হয়েছে এবং এই নিয়ম এক একজন শিল্পপতিকে বাধ্য করছে তার যন্ত্রপাতি সর্বদা আরও উন্নত করতে, তার উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমাগত আরও বাড়িয়ে যেতে। উৎপাদন ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সম্ভাবনাটাও তার কাছে অনুরূপ একটি বাধ্যতামূলক নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক শিল্পের বিশাল সম্প্রসারণ শক্তির কাছে গ্যাসের সম্প্রসারণ শক্তিকে মনে হয় নিছক ছেলে খেলা। গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ক্ষেত্রে এই সম্প্রসারণ একটা প্রয়োজন হিসাবেই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। যা কোনও বাধাকেই পরোয়া করে না। এই বাধা আসে উপভোগ থেকে, বিক্রি থেকে আধুনিক শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার থেকে। কিন্তু ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিক থেকে বাজারের সম্প্রসারণ ক্ষমতা মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু নিয়মের দ্বারা— যার তেজ অনেক কম সক্রিয়তা নিয়ে কাজ করে।

উৎপাদন বৃদ্ধির গতির সঙ্গে বাজারের সম্প্রসারণ তাল রাখতে পারে না। সংঘাত অনিবার্য হল ওঠে এবং যতদিন না পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে ভেঙে চূর্ণ করে দেওয়া হলে তত দিন যেহেতু এর মধ্য থেকে কোনও প্রকৃত সমাধান বেরিয়ে আসতে পারে না, তাই সংঘাত পর্যায়ক্রমে মাথাচাড়া দিতে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন জন্ম দেয় আরও এক ‘দুষ্ট চক্রের’।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 3 Bengali Weekly Auguat 16, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের ১২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ আগস্ট দলের শিবপুর সেন্টারে মহান এঙ্গেলসের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

এসইউসিআই(সি)-র কেন্দ্রীয় অফিসে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা

রাজ্য জুড়ে শহিদ ক্ষুদিরাম স্মরণ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বীর বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরামের ১১৭তম আত্মোৎসর্গ দিবস ১১ আগস্ট যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল দেশ জুড়ে। এ রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি পালিত হয় কলকাতা হাইকোর্টের সামনে ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মাল্যদান ও আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে (ছবি)।

এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন কমসোমল এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রিকা পথিকৃতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে ক্ষুদিরামের মূর্তিতে গার্ড অফ অনার জানায় কমসোমল। সমস্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদানের পর বিপ্লবী ক্ষুদিরামের জীবনসংগ্রাম ও আজকের সমাজবিপ্লবে তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি)-র কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বনমালী পণ্ডা। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মহুয়া মাইতি। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রবি বসু।

এ ছাড়াও মেছেদা, বহরমপুর এবং কোচবিহারে ক্ষুদিরাম মূর্তিতে মাল্যদান এবং আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা সহ রাজ্যের জেলায় জেলায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুত্বপূর্ণ নানা স্থান, বাজার, গঞ্জ, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড সহ অন্যান্য স্থানে শহিদ ক্ষুদিরামের ছবিতে মাল্যদান ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও যথাযথ মর্যাদায় দিনটি পালিত হয়।

ভারত-পাকিস্তান সম্প্রীতির চমৎকার নজির খেলোয়াড়-পরিবারের

২০২৪-এর প্যারিস অলিম্পিকে জ্যাভলিন প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের নাদিম প্রথম এবং ভারতের নীরজ দ্বিতীয় হয়েছেন। গত বারের চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়াকে হারিয়ে প্রথম হয়েছেন আরশাদ নাদিম। পাকিস্তানের প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে নাদিম সোনার পদক জিতে বলেছেন, বহু থ্রো-ই তিনি নীরজের থেকে শিখেছেন।

রূপোর পদক পাওয়ার পর পানিপথের ছেলে নীরজ চোপড়ার গ্রামে তখন উৎসবের মেজাজ। সাংবাদিকরা তাঁর মা সরোজ দেবীর কাছে জানতে চান, আপনি কি খুশি? তিনি বলেন, অবশ্যই। রূপোই আমাদের সোনা। সোনা তো জিতেছে নাদিম। সেও তো আমার আর এক ছেলে।

আবেগাপ্লুত নীরজের বাবা তাঁর ছেলের পদক উৎসর্গ করেছেন ভারতের কুস্তিগির বিনেশ ফোগটকে। বিনেশ অলিম্পিকের ফাইনাল রাউন্ডে ১০০ গ্রাম বাড়তি ওজনের কারণে বাতিল হয়েছেন। ক্রীড়াপ্রেমী প্রতিটি মানুষ যখন এতে মুষড়ে পড়েছেন, বিনেশও খেলা থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন, তখন নীরজের বাবার পদক উৎসর্গ এক অনন্য নজির সৃষ্টি করল।

নাদিমের মা রাজিয়া পারভিনের মুখেও শোনা গেল একই অভিব্যক্তি। নীরজও আমার সন্তান। সে নাদিমের বন্ধু ও ভাই। জেতা-হারা খেলার অঙ্গ। নীরজ আরও ভাল খেলবে, আরও অনেক পদক পাবে, সেই আশা করি।

যখন ভারত-পাকিস্তানের কোনও খেলা মানেই দু'দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়তে থাকা, একে অপরের শত্রু হিসাবে দাগিয়ে রাখার অনুশীলন যখন দু'দেশের শাসকরা প্রতি মুহূর্তেই চালাতে থাকে, সেই সময় দুটি দেশের খেলোয়াড়দের আবেগঘন সম্পর্ক আর তাঁদের বাবা-মায়েদের পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন, আপামর দেশবাসীকে আবেগে আপ্লুত করে দিয়েছে।

এ বারের প্যারিস অলিম্পিকের মতো অনন্য ঘটনা এর আগেও ঘটেছে ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপে। ইরান এবং মার্কিন শাসকদের প্রবল শত্রুতার মধ্যেও একটি ম্যাচে দুই দেশের ফুটবলাররা সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরেছিলেন। ফুল ও উপহার দিয়ে এবং গ্রুপ ফটো তুলে দুটি দেশের ফুটবলাররা পারস্পরিক উষ্ণ সম্পর্কের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

'স্পোর্টসম্যান স্পিরিট' আসলে কী, তা নাদিম-নীরজরা দেখিয়ে দিলেন। দেখিয়ে দিলেন, খেলা দু'টি মানুষের মধ্যে কত বড় সেতুর কাজ করতে পারে, সব মানুষের মধ্যে ঐক্যের সুর বেঁধে দিতে পারে, দূর করে দিতে পারে সব বিভেদ।

কর্তব্যরত ডাক্তারেরও রেহাই নেই!

চারের পাতার পর

হয়। রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তাররাও আন্দোলনে কোথাও কর্মবিরতি, কোথাও অবস্থান করেন। রাস্তা অবরোধ হয়। এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে ১০ আগস্ট সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়। কলকাতা সহ সমস্ত জেলায় অসংখ্য বিক্ষোভ মিছিল, রাস্তা অবরোধ, পথসভা ইত্যাদি হয়।

আর জি কর মেডিকেল কলেজে জুনিয়র ডাক্তার ও ছাত্ররা লাগাতার অবস্থান শুরু করেন। এই আন্দোলন ভাঙার জন্য শাসক দলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কোনও অজ্ঞাত শক্তিকে দিয়ে অবস্থান মঞ্চের উপরে টাঙানো ত্রিপল ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আর কিছু করতে না পারুক, শান্তি রক্ষার নামে অন্য হাসপাতাল থেকে আর জি করে আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে চাওয়া ডাক্তার ও ছাত্রদের মারধর করে রক্তাক্ত করেছে। কিছু মেডিকেল কলেজে বলা হয়েছে, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা নয়, একমাত্র টিএমসিপি পরিচালিত ইউনিয়নের নামেই অবস্থান করা যাবে। নানা ভাবে তারা আন্দোলনে বাধা দিয়েছে। যদিও রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজেই প্রতিবাদে নানা কর্মসূচি চলেছে।

১১ আগস্ট আর জি করের রেসিডেন্ট ডাক্তাররা জানিয়ে দেন— সমস্ত অপরাধীকে চিহ্নিত করা, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট প্রকাশ করা, সিসিটিভি-র ফুটেজ আন্দোলনকারীদের দেখানো, বিচারবিভাগীয় নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করা ও চিকিৎসক সহ হাসপাতালের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তাঁরা সম্পূর্ণ কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন। ১২ আগস্ট সারা দেশের চিকিৎসকরাও কর্মবিরতি পালন করেন।

প্রতিবাদের এই ঝড় না উঠলে সরকার যতটুকু পদক্ষেপ নিয়েছে তাও নিত না। সামগ্রিকভাবে হাসপাতালের নিরাপত্তা, বিশেষত মেয়েদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য আন্দোলন চলবেই। কিন্তু যে সমাজ পরিবেশ এবং নেতাদের আখের গোছানোর যে নোংরা রাজনীতি এই সমস্ত দুষ্কৃতীর জন্ম দিয়ে চলেছে আন্দোলনের অভিমুখ ধাবিত করতে হবে সে দিকেও। না হলে এমন সম্ভাবনাময় মেধাবী কত সন্তান হারিয়ে যাবে সমাজের কোল থেকে! যারা হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারত, নতুন সমাজ আনার স্বপ্ন দেখাতে পারত, আর জি করের এই চিকিৎসক মেয়েটির মতো তারাও হয়ত এমন করেই নিথর ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে হারিয়ে যাবে চিরতরে। এই দুঃসময়ে নীরবতা ক্ষমাহীন অপরাধ। মনুষ্যত্বের দীপশিখা জ্বালিয়ে এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে, বিবেকবান মানুষ নিশ্চয়ই তা অস্তমিত হতে দেবেন না।

১০ আগস্ট দলের ডাকা প্রতিবাদ দিবসে দমদমে মিছিল

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com